পায়ে পায়ে পথ

মহীতোষ বিশ্বাস

প্রাপ্তিস্থান

পুনশ্চ

৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

০ এক ০

বিলভাসানের চাষিদের গ্রামগুলোতে এখন আর আগের দিন নেই। এখন দিনকাল পালটেছে। কয়েকটা গ্রাম মিলে হাইস্কুল হয়েছে। পোষ্টাফিস বসেছে। গাঁয়ের স্কুল থেকে পাস ক'রে ছেলেরা মেয়েরা পড়তে যায় দূরের শহরে কলেজে। চাষের কাজে লাভ নেই ভেবে কোনো কোনো গাঁয়ের জোয়ান ছেলে শহরে ছোটে। সেখানে কল-কারখানার চাকরিতে কাঁচা পয়সার হাতছানি। বিশ-বাইশ বছরের অবিবাহিতা শিক্ষিতা তরুণী মেয়ে দিব্যি স্বচ্ছন্দে গাঁয়ের রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ায়। কোনো চাষির সৌখিন ছেলে ধানক্ষেতের আলে ব'সে গান শোনে ট্রান্‌জিস্‌টারে। যে মেয়েরা নানাকারণে লেখাপড়ার সুযোগ পায়নি, তারাও শহুরে প্রসাধনের নানারকম কলাকৌশল আয়ত্ত করে। ঠাট-ঠমক শেখে। বিলভাসানের কোনো চাষি এখন আর হাঁটু পর্যন্ত কাপড় প'রে খালি গায়ে পাশের গাঁয়ে কুটুম-বাড়ি যেতে উৎসাহ পায়না। একটি জামা অন্তত গায়ে থাকা চাই। নিদেন-পক্ষে একটা চাঁদ-গলার গেনজী। আর পায়ে একজোড়া চটি থাকলে তো কথাই নেই। লেখাপড়ার প্রচলন ঘ'টে আস্তে আস্তে গ্রামের ছেলেমেয়েগুলি শিক্ষিত হচ্ছে। আর সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে বিলভাসানের গ্রামগুলির বহুদিনের জমে থাকা অজ্ঞতার অন্ধকার। শোষণ, বঞ্চনা, নিপীড়ন—এসব চাষিদের জীবনে এখনো আছে। জীবনচর্যার সামগ্রিক রূপটাতেও তেমন কোনো ব্যাপক পরিবর্তন হয়নি। তবু শিক্ষাদীক্ষার প্রসার, সামাজিক রাজনৈতিক পরিবর্তন, বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ—এসবের মধ্যে দিয়ে বিলভাসানের চাষিদের জীবনে এখন বেশ কিছুটা অদল-বদল ঘটেছে বইকি!

কিন্তু এ কাহিনীর শুরু যখন, তখন বিলভাসানের চেহারা ছিল অন্যরকম। আদিগন্ত নিচু জলা জমি। গোটা বর্ষা আর শরৎকাল জলে জলে ভাসমান। তাই বুঝি নাম হয়েছে বিলভাসান। আর এই বিলভাসানের বিল অঞ্চল জুড়ে পাশাপাশি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে বিলভাসানের গ্রামগুলো। বর্ষায়-শরতে জলে থই থই। খরা-শুকনোর দিনে ধুলোভরা মাটির পথ আর ঠাঠা-করা মাঠ-ঘাট। জীবনে এখানে বৈচিত্র্য বড়ো বেশি নয়। 'চাষবাস-বারোমাস'—আর এই চাষবাসকে কেন্দ্র করেই এখানে জীবনের সুখ-দুঃখের ওঠা-নামা ঘটে। মাঠের ফসল যদি ভালো ফলে, আর জোতদার-জমিদারের পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে কিছু শস্যের দানা যদি গোলায় তোলা যায়, তবেই চিত্তে সুখ। আর বন্যায়-খরায় যদি মাঠের ফসল মাঠেই শেষ হয়ে যায়, তবে নিজেদের পেটেই বা কী পড়বে, আর পাওনাদারের পাওনাই বা মিটবে কি দিয়ে। তাই পাল-পার্বণই হোক, আর বিয়ে-শাদি, শ্রাদ্ধের ভোজই হোক, ফসলের দেবতার প্রসন্নতাটুকু আগে দরকার। সব মিলিয়ে জীবনের গতি এখানে বড়ো নিস্তরঙ্গ, মন্থর। পূজা-পার্বণ, সমাজ-সামাজিকতার উৎসব, বর্ষাকালে বিলভাসানের ভাসান জলে নৌকা-বাইচ, শুকনোর দিনে গোরুর দৌড়—সবই আছে। কিন্তু এগুলো বিলভাসানের চাষিদের পক্ষে কোনোটাই কিছু অপ্রত্যাশিত নয়। ব্যাপারগুলো সহজ

স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মের মতো একটার পর একটা ওদের জীবনে আসে। হৈ চৈ ক'রে ওরা সে উৎসবে মাতে। সাড়া দেয়। দুঃখ-শোকের দিন এলে কয়েকদিন মুহ্যমান হয়ে থাকে। আবার যে কে সেই। বিলভাসানের শান্ত নিস্তরঙ্গ দিনগুলো বয়ে চলে। কিছু আদিম বিশ্বাস, কিছু সঙ্কীর্ণতা, দলাদলি, দিন-চর্যার গতানুগতিক প্রবহমানতা, আর অনটন-স্বাচ্ছন্দ্যে, শোষণে বঞ্চনায়—সব ক্ষেত্রেই সরলতা অজ্ঞতায় মেশানো প্রচণ্ড ভাগ্য-নির্ভরতা—এই নিয়েই বিলভাসানের চাষিদের জীবন।

বিদ্যাচর্চার সময় বা সুযোগ—কোনোটাই বড়ো একটা ছিলনা এখানে। একটু বয়স বেড়ে গায়ে হাত পায়ে তাকত দেখা দিলেই চাষির ছেলেকে বাপ-কাকার সঙ্গে ক্ষেতের কাজে 'জোগাল' দিতে হয়। গোরু-বাছুর গুলোকে চরিয়ে নিয়ে বেড়াতে হয়। এসব কাজের ফাঁকেও হয়ত লেখা-পড়ার কাজের জন্য একটুখানি সময়ের সঙ্কুলান করা অসম্ভব নয়। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো মুশকিল—সুযোগ কোথায়! এ-তল্লাটে স্কুল ব'লে কোথাও কিছু ছিলনা। সুতরাং কে-ই বা শিখবে, আর কে-ই বা শেখাবে! তাছাড়া লেখাপড়া শেখবার দরকারটাই বা কি! চাষির ছেলে—বাপ ঠাকুর্দার হাতের কাজ, চাষবাস শেখো। হিসেব-পাতির জন্যে এক কুড়ি পর্যন্ত গুনতে শেখো। আর তাহলে পায় কে! এইটুকু ভাঙিয়ে খেতে পারলেই ভাতের অভাব হবে না। তবে মুশকিল হয় দলিল-পরচা দেখা, আর খাজনা পত্রের কাগজ পড়ার সময়। তখন একটু 'চোখ' না থাকলে তো চলে না। তবে মোটামুটি সব গাঁয়েই এ-রকম এক-আধজন 'চোখ-ওয়ালা'—অর্থাৎ একটু-আধটু পড়তে জানা লোক দুর্লভ নয়।

অবশ্য বকেয়া খাজনার হিসেব-পত্রের কাগজ পড়তে পারলেই বা কি, আর না পারলেই বা কি। নায়েবমশাই যেটা বলবেন, সেটাই বেদ-বাক্যি। পাঁচ আনা খাজনার বদলে দশ আনা দেবার হুকুম-নামা এলে যদি কেউ হাত-জোড় ক'রে বলে—'এ'জ্ঞে বাবুমশায়, ওটা তো মনে কয়, দশ আনা হবেন না, পাঁচ আনা হবেন।'—বাবুমশায় তৎক্ষণাৎ ধমক লাগাবেন—'আরে হেই ব্যাটা, চাষির ঘরে এয়েছেন বিদ্যেসাগর—থাম তুই।'—অগত্যা থামতেই হয়। এবং পাঁচ আনার বদলে দশ আনাই খাজনা দিতে হয়। আর নাহলে পাইক এসে গলায় গামছা দিয়ে টেনে নিয়ে যাবে কাছারিবাড়িতে। তারপর উত্তম-রূপ 'নাদান' দেবার ব্যবস্থা করবে। মোটামুটি এই হলো বিলভাসানের চাষিদের নির্দিষ্ট ছকে-বাঁধা জীবন। আর এতেই এরা অভ্যস্ত। এখানে আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত কোনো কিছু বড়ো একটা ঘটে না। সে রকম কিছু হঠাৎ ঘটলে মাত্রা ছাড়িয়ে যায় এদের বিস্ময়ের বোধটাও।

বিলভাসানের সেই আমলের চাষিদের পক্ষে তাই এ-রকম একট ঘটনা রীতিমতো বিস্ময়ের। অবশ্য এর আগেও আর একটা ঘটনা ঘটেছিল। সেটাও এই মাস কয়েক আগের কথা।

নিবারণ দাস আর ভরত বিশ্বাস ভিন্-গাঁয়ের কুটুম-বাড়ি থেকে বাড়ি ফিরছিল। শীতের দুপুর। ধান-কাটা শূন্য ক্ষেতগুলো শীতের রোদ্দুরে ঝিম্ মেরে পড়েছিল। নিবারণ আর ভরত কুটুম বাড়ির নানারকম গল্প-গুজবে মশগুল হয়ে পথ চলছিল। হঠাৎ মাথার উপরে একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ হতেই থমকে দাঁড়াল দুজনে। উড়োজাহাজ। আগে হলে ভয় পেতো। এখন আর ভয় পায়না। খানিকটে অভ্যেস হয়ে গেছে। বছর কয়েক হলো, বিলভাসানের মাথার উপর দিয়ে

প্রায় রোজই দু'চারখানা উড়ো জাহাজ যায়। প্রথম প্রথম গোটা তল্লাটের লোক কী ভয়টাই না পেয়ে গিয়েছিল। কত রকমের গল্পই যে চালু হয়েছিল উড়োজাহাজ নিয়ে! গান বেঁধেছিল রাখাল ছেলেরা। এখন আর উড়োজাহাজ নিয়ে বড়ো একটা কেউ মাথা ঘামায় না। তাছাড়া, আরো নানা-রকমের অভিজ্ঞতাও বাড়ছে। কোথায় নাকি বিরাট এক লড়াই বেধেছে। বিলেত, জার্মানী সব বড়ো বড়ো শহর। সেখানে নাকি দুম্‌দাম্ বোমা পড়ছে রাতদিন। ইংরাজ, আমেরিকা, জাপান, সুভাষ বোস, গান্ধী, জিন্না—নানারকম অদ্ভুত অদ্ভুত দেশ আর লোকের নাম শোনে। বাসুন্দের হাটের ওদিকে চাকুরে-বাকুরে ব্যবসায়ী ভদ্রলোকদের বাস। ওখানে খবরের কাগজ আসে। তাতে নাকি লেখা থাকে এসব কথা।

হাটের দিন হাট-ফেরত বিলভাসানের অধিবাসিরা এসব খবর জোগাড় করে। খবরের চেয়ে গুজবই বেশি। আর চোখেও কিছু কিছু দেখে বইকি! মাথার উপর দিয়ে উড়োজাহাজের যাতায়াত তো রোজই দেখছে। বাসুন্দের হাটে যাতায়াতের পথে আরো কত কি চোখে পড়ে। বাসুন্দের হাটের পাশ দিয়ে চলে গেছে একটা পাকা ইঁটের রাস্তা। ঐ রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে দেখা যায় রাঙামুলোর মতো সাহেবরা চলেছে। সঙ্গে তাদের কত জিনিস। উটের না হয় ঘোড়ার পিঠে সেগুলো চাপিয়ে রাস্তার ধুলো উড়িয়ে এগিয়ে চলে। সব মিলিটারীর লোক। ভয়ে কেউ সামনে যেতে সাহস পায়না ওরা। রাস্তা ছেড়ে দূরে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখে। আর এমনি ক'রেই একটু একটু ক'রে বাড়ছিল বাইরের জগতের অভিজ্ঞতার সীমাটা। তাই মাথার উপর দিয়ে এরোপ্লেন দুটোকে গোঁ গোঁ ক'রে চলে যেতে দেখেও নিবারণ আর ভরত তেমন আমল দিলো না। নিজেদের আলোচনায় মগ্ন থেকে পথ চলতে লাগল।

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ভরত। অগ্রবর্তী নিবারণ কিঞ্চিৎ বয়স্ক। একটু কুঁজো হয়ে হাঁটছিল। ভরত হাউমাউ ক'রে নিবারণকে জড়িয়ে ধ'রে বলল—'ও খুড়ো, কাণ্ড দেখ্‌তিচো—।'

নিবারণ একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল—'বল্‌বি তো কি হলো?'

অবশ্য ভরতকে আর কিছু বলতে হলোনা। প্রচণ্ড গর্জন শুনে নিবারণও তাকাল উপরের দিকে। তারপর ভয়-চকিত গলায় চিৎকার ক'রে উঠল—'আরে বাবারে বাবা,—শালারা পাক মারতি নাগিচে।'—

—সত্যিই তাই। এরোপ্লেন দুটো তখন মাথার উপর আস্তে আস্তে চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছিল। এবং একটু বাদেই নেমে পড়ল সামনের বিরাট ফাঁকা গো-চর মাঠটায়। ঘটনাটার আকস্মিকতায় ভীষণ রকম ঘাবড়ে গেলো নিবারণ আর ভরত। ছুটে পালানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল দুজনেই। কিন্তু অতিরিক্ত ব্যস্ততার জন্যেই বোধহয় দুজনে জড়াজড়ি ক'রে সেই রাস্তার ধুলোর মধ্যে গড়াগড়ি খেতে লাগল।

দিব্যি পরিষ্কার ফটফটে আকাশের এই দৃশ্যটা তখন বিলভাসানের গ্রামগুলোর লোকজনদের চোখে পড়েছে অনেকেরই। তুমুল একটা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। কী,-না, গো-চরের মাঠে উড়োজাহাজ নেমেছে। ছোট্—ছোট্—। হাতের কাজ ফেলে যে যে অবস্থায় ছিল, ছুটে এসে জমা হলো মাঠটার চারপাশে। ভয়ে কেউ কাছে ঘেঁষতে সাহস পেলোনা।

কিন্তু দূরে দাঁড়িয়ে যা দেখল, তাতেই চোখ চড়কগাছ হয়ে গেলো সকলের। সকলে হা ক'রে

এরোপ্লেনটার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখতে লাগল। ওদিকে দুটো এরোপ্লেন থেকেই তখন নেমে এসেছে কয়েকজন গোরা সাহেব। কী সব যন্ত্রপাতি বের ক'রে একখানা এরোপ্লেনের গায়ে খানিক ঠোকাঠুকি করতে লাগল। বোধহয় কোনো কলকব্জা বিগড়ে মাঝপথে এই বিপত্তি। একটু বাদেই সাহেবগুলো কলকব্জা ঠিক ক'রে এরোপ্লেনের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। আর হুস্ ক'রে দু'খানা এরোপ্লেনই আকাশে উঠে গিয়ে মিলিয়ে গেলো দিগন্তে।

ঘটনাটা ঘটে গেলো ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই। কিন্তু এর একটা বিরাট প্রতিক্রিয়া ঘটল বিল-ভাসানের চাষিদের মধ্যে। এর ভালোমন্দ নিয়ে আলোচনা হলো। কোথাও বা এটাকে কোনো দৈব অভিশাপের ফল ভেবে তার হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য মাদুলি-কবচ ধারণের ব্যবস্থা হলো। হরি-সংকীর্তনের আসর বসল। আবার রাখাল ছেলেরা এটাকে নিয়ে মজাদার গানও বাঁধল। সব মিলিয়ে এটা একটা নতুন ধরনের উত্তেজনা বয়ে আনল বিল-ভাসানের চাষিদের মধ্যে।

কিন্তু এর মাস কয়েক বাদে আর একটা যে ঘটনা ঘটল, সেটার প্রকৃতি একটু অন্য রকমের। সদ্য উত্তেজনার প্রাখর্য তাতে কম থাকলেও বিলভাসানের চাষি মানুষেরা ঘটনাটায় প্রথমে বড়ো ভাবিত হলো। তারপর তাদের গতানুগতিক সরল জীবনযাত্রার চিন্তাধারায় একটা মোড় নিতে শুরু করল ধীরে ধীরে। হয়ত নিজেদের অলক্ষ্যেই।

জ্যৈষ্ঠ মাসের সবে শুরু। কয়েক দিনের অল্প-স্বল্প বর্ষণেই বেশ তেজালো হয়ে উঠেছিল আমন ধানের চারাগুলো। সারা বিল জুড়ে সবাই এখন নিড়ান বাছাইয়ের কাজ করছে। বিল-প্রান্তের পশ্চিম কোণটায় ঐ রকমই একটা দল ধানক্ষেতে ব'সে কাজ করছিল। ওরই মধ্যে ব্যাপারটা প্রথম চোখে পড়ল রণপতির। রণপতির বয়স তিন কুড়ি শেষ হয়ে চার কুড়িতে পড়ো-পড়ো করছে। কিন্তু চোখের ধারটা এখনো বড়ো তীব্র। উঠে দাঁড়িয়ে হাতের আগল দিয়ে পড়ন্ত বেলার রোদের আলোটাকে আড়াল দিয়ে বলল—'হ্যাঁরে, দ্যাখ্তো নোক্টা যায় কোন্ দিকি—।'

রণপতির কথায় সবাই একটু কৌতূহলী হয়ে ওঠে। দু'একজন উঠে দাঁড়িয়ে রণপতির উদ্দিষ্ট দিকে তাকায়।

বিলভাসানের পশ্চিমদিকে খানিকদূরে গিয়ে ডাঙা অঞ্চলের শুরু। ওটাই এ-পাশে বিলভাসানের সীমান্ত অঞ্চল। ও-দিকটায় গাছপালার পরিমাণটা একটু বেশি। আর ঐ গাছপালার ভিতর দিয়ে ধপধপে সাদা জামা-কাপড় পরা একটা মানুষের মূর্তি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল বিলভাসানের সমতল নিচু ক্ষেতগুলোর মধ্য দিয়ে। লোকটির হাঁটা-চলার ভঙ্গি, কিম্বা পোশাক-পরিচ্ছদের দিকে একনজর তাকালেই বোঝা যায়, এ আর যেই-ই হোক, বিলভাসানের কেউ নয়। ফলে এদের কৌতূহল আরো বেড়েই চলল। একটু বাদেই একেবারে ওদের কাছে এসে পড়ল লোকটি। হঠাৎই ঘটল এক অঘটন। দলের একেবারে শেষ প্রান্তে ব'সে ঘাস নিড়োচ্ছিল কণ্ঠীরাম। হঠাৎ মাথাটা একটু উঁচু ক'রে দেখেই—'ওরে বাবারে—আমারে ধরতি আস্তিছে রে—' বলেই পড়ি মরি ক'রে দে ছুট্।

কণ্ঠীরামের এই ছেলেমানুষী কাণ্ড দেখে অবাক হলো সকলে। কিন্তু তা নিয়ে কেউ হাসাহাসি করার সুযোগ পেলোনা। কারণ আগন্তুক লোকটি তখন একেবারেই কাছে এসে পড়েছেন। দলের সকলে তখন বিস্ময়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। প্রথমে চিনতে পারল বয়োবৃদ্ধ রণপতি। একটু

এগিয়ে গিয়ে হাত জোড় ক'রে বলল—'আজ্ঞে ছোটোবাবু, আপনি এদিকি কি মনে ক'রে? পেরণাম হই!'

ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের ঈষৎ শ্যামলা রঙের সুদর্শন যুবক। রণপতির কথার জবাবে একটু হেসে জবাব দিলেন—'এই এলাম তোমাদের এদিকে।'—

এলেন তো বটে! কিন্তু কেন যে এলেন, সেটাই তো বোঝা যাচ্ছে না। দলের মধ্যে তখন জোর কানা-ঘুষো শুরু হয়েছে। ছোটোবাবুর চেহারার সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও নামের সঙ্গে সকলেরই পরিচয় আছে। বাসুন্দের জমিদার, তাদের অনেকের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা—বৈকুণ্ঠ মুখার্জী মশায়ের ছোটো ছেলে সত্যপ্রসাদ মুখার্জী। কলকাতায় থেকে কী সব অনেক লেখাপড়া করেন। হঠাৎ এই মাঠঘাটের রাস্তায় তাদের মতো চাষা-ভুষোদের মধ্যে ছোটোবাবুকে দেখে সকলের বিস্ময়ের আর সীমা রইল না।

তবে, দুই আর দুইয়ে মিলে যেমন চার হয়, তেমনি ছোটোবাবুর আগমন, আর কণ্ঠীরামের আকস্মিক পলায়নের একটা কারণও আবিষ্কার করে ফেলল তারা। কয়েকদিন আগে বৈকুণ্ঠ মুখার্জী মশাই তাঁর বাড়ির কি কাজে বেগার ধরেছিলেন। সকলেই প্রায় হাজির হয়েছিল। সারাদিন বেদম খেটে কাজও তুলে দিয়ে এসেছিল। কিন্তু যে দু'চার জন যেতে পারেনি, তাদের উপর নাকি বৈকুণ্ঠ মুখার্জী মশাই বিস্তর রেগে রয়েছেন। কাকে কাকে নাকি কাছারি-বাড়িতে ধরে নিয়ে পাইক-পেয়াদাদের দিয়ে মারও দিয়েছেন আচ্ছা ক'রে। কণ্ঠীরামকেও নাকি খুঁজে বেড়ানো হচ্ছে। তাহলে কি ছোটোবাবু কণ্ঠীরামকে ধরতে এসেছেন? কিন্তু, তা যদি হবে, তাহলে সঙ্গে পাইক কোথায়? পেয়াদা কোথায়? কি জানি বাবা! বাবু-লোকদের মতিগতি বোঝা ভার। হয়ত আগে তাদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে সব খবর নিতে এসেছেন।

ওদিকে ছোটোবাবু তখন রণপতির সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছেন—

—'তোমাকে সেদিন কাছারি-বাড়িতে দেখেছিলাম না? বাবার সঙ্গে খাজনার বিষয়ে কথা-বার্তা বলছিলে!'

মনে পড়ল রণপতির। দিন কুড়ি আগে ওরা কয়েকজন মিলে বৈকুণ্ঠবাবুর কাছে আরজি জানাতে গিয়েছিল। গত দু'সন খরায় ধান ভালো হয়নি। পাটের ফলনও যৎকিঞ্চিৎ। এ-সনের ফসল পেয়ে বাকি খাজনা আর ধার-দেনা শোধ দেবার আবেদন নিয়ে সবাই বৈকুণ্ঠবাবুর বাড়িতে গিয়েছিল। তারা জাতে ছোটো। চাষি। তাই কাছারি-ঘরের বারান্দায় উঠতে সাহস পায়না। বারান্দার নিচে গামছা বিছিয়ে সবাই বসেছিল বৈকুণ্ঠবাবুর আসবার অপেক্ষায়। বাবু সকালবেলার পূজাহ্নিক সেরে জলখাবার খেয়ে দর্শন দেবেন।

ব'সে থাকতে থাকতে রণপতিরা লক্ষ করেছিল, ও-পাশের শিব-ঠাকুরের মন্দিরের পাশে বেলগাছের ছায়ায় এক বাবু ঝোলা কাপড়ের চেয়ারে (ইজিচেয়ার) শুয়ে বই পড়ছেন। ওরা মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকিয়ে দেখছিল। ফ্যালা-কামার বৈকুণ্ঠবাবুর বাড়ির বাঁধা চাকর। ওদের চেনে। ওদের ঘন ঘন তাকাতে দেখে এক ফাঁকে এসে বলেছিল—'চিনতে পারছিস্ না? এই আমাদের সেই ছোটোবাবু। —কলকাতায় লেখাপড়া করেন। —বড়ো নেতা হয়েছেন!'—